পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা...গবেষণা ও বর্ণনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম তার বিশ্বস্ত রাসূলের উপর।

আম্মাবাদ:

আমি ১২/১/১৪২৪ হিজরীতে এ বিষয়ে লিখেছিলাম এবং তা প্রকাশও করেছিলাম। কিন্তু তাতে আমার উপর কিছু প্রশ্ন আরোপিত হয়। বিরোধীদের থেকেও অনেক অভিযোগ আসে। কিন্তু তাদেও প্রশ্ন ও আপত্তি আমাকে আরও দৃঢ় করেছে।

যখনই কোন প্রতিদ্বন্দি প্রতিদ্বন্দিতা করতে এসেছে, তার কথার পূর্বে চেহারায়ই দুর্বলতা ফুটে উঠেছে। তাই আমি যুক্তি ও বর্ণনার মাধ্যমে মাসআলাটিকে পর্যালোচনা করেছি। তাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উক্তি সংযোজন করেছি এবং পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার মাধ্যমে মাসআলাটিকে স্পষ্ট করেছি।

আমি মনে করি, এটা ইবনে আব্বাস রা: এর বর্ণনাগুলোর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ। আমি তা থেকে এই সারনির্যাস বের করেছি যে, ইবনে আব্বাস রা: এর বর্ণনাটি ইজমার বিপরীত নয়। বরং তিনিও কুফরের প্রবক্তাদেরই একজন।

এখানে কেউ চমকে উঠতে পারে এবং বিরোধীগণ হতবাক হয়ে যেতে পারেন, যখন দেখবেন, ইবনে আব্বাস রা: তাদের বিরুদ্ধে!! কিন্তু কে পারে সৃষ্টির উপর হককে প্রাধান্য দিতে??

কে পারে অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সা: এর বিশুদ্ধ সুন্নাহকে আকড়ে ধরতে??

কে পারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে??

উত্তর হচ্ছে, যাকে আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন কেবল সে ই।

উপক্রমণিকা

আমরা যে বিষয়টির অবতারণা করেছি, আল্লাহর সৃষ্টিতে এমন কিছু নেই, যা তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা কতিপয় সুস্পষ্ট কারণে ও সমুজ্জল প্রমাণের ভিত্তিতে। এটি সর্বোচ্চ স্পর্শকাতর এবং চূড়ান্ত ভয়াবহ বিষয়।

এর মাধ্যমেই অনেক জাতির উত্থান হয় এবং অনেক জাতির হয় পতন। এর মাধ্যমেই অনেক জাতি উন্নতির শিখরে আরোহন করে আর অনেক জাতি হয় লাঞ্ছিত ও অপদস্ত।

সময়ের দাবি, কালের প্রতিকূলতা ও যুগের ফিতনার কথা বলে কত মানুষ এতে দিকভ্রান্ত হয়েছে, কত মানুষ ফিতনায় পড়েছে আর কত মানুষ হয়েছে মুরজিয়া! তার পরিসংখ্যান আল্লাহই ভাল জানেন।

সে বিষয়টি আর কিছু নয়; শাসনকর্তৃত্ব

এ ধরণের বিষয় প্রবৃত্তির তাড়না, দুনিয়ার সম্পৃক্ততা, স্বল্প ইলম বা কম বুঝের দ্বারা সমাধান করা যায় না। কারণ, এর কারণে সম্মুখীন হতে হয় ভয়াবহ পরিণতির, কঠিন অবস্থার।

একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন, এ বিষয়টি আমার কত সময় নিয়েছে! আমি এর গভীরতা ও চূড়ান্ত ফলাফলের ব্যাপারে কত চিন্তা করেছি! হয়ত তা দশ বছরেরও অধিককাল হবে।

এটা আমার অন্তরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল, আমার হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছিল। আমি এর অনেক ব্যতিক্রমী বিষয়, উপকারী কথাবার্তা, দূর্লভ জ্ঞান ও বিভিন্ন মূলনীতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

আর আমি সর্বান্ত আল্লাহর কিতাবকে আকড়ে থেকেছি। আমার অবস্থা এমন ছিল যেন, আমি রক্ত দিয়ে তা অঙ্কন করেছি এবং সেই অমূল্য কালি দিয়ে তা লিখেছি, যা মহা পেরেশানী ও কঠিন চিন্তার দিন আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করবে।

এই কথাটির কারণে আমি আমার অনেক এমন বন্ধুকে পরিত্যাগ করেছি, যারা এখন আমার শত্রু হয়ে গেছে। এমন অনেক সহপাঠিদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, যারা আমার জীবনের সঙ্গী ছিল।

শুধু তাদের এমন কতিপয় কথার কারণে, যা অন্ধ অনুকরণ ও নিছক অনুসরণের সৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহই আমার লক্ষ্য। তিনিই আমার অভিভাবক ও আমাকে সরল পথের দিশা দানকারী।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

আমি যে তথ্যসূত্র ও দলিল-প্রমাণ নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, তা কেবল তার কিতাব ও তার নবী সা: এর সুন্নাহয় যা পেয়েছি তা ই।

যা ধর্মচ্যুত রাফেযীদের বুঝের মত নয়, নাস্তিক জাহমিয়াদের মত নয়, অগ্নিদগ্ধ মুরজিয়াদের মত নয় এবং না বিচ্ছিন্নতাবাদী খারিজীদের মত।

বরং উম্মাহর সেই সকল নেককার পূর্বসূরীদের বুঝের আলোকে, যারা স্বীয় প্রভুর নূর দ্বারা স্পষ্ট দলিল আকড়ে থেকেছেন।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের নিদর্শনাবলী থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত অন্বেষণ করেছি এবং অশুদ্ধ বিষয়কে শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত থেকেছি।

আর প্রত্যেকটিই করেছি সর্বাধিক স্পষ্ট বর্ণনা ও শক্তিশালী প্রমাণের আলোকে।

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি:

নামায, রোজা, জবাই, দু'আ, মান্নত ইত্যাদি ইবাদতসমূহের মত শাসনকর্তৃত্বও একটি ইবাদত। এগুলোর মাঝে কোন ব্যবধান নেই।

এর দলিল হল আল্লাহর কিতাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ}

"শাসন একমাত্র আল্লাহরই জন্য, তিনি আদেশ করেছেন, তোমরা একমাত্র তারই ইবাদত কর। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।"

পবিত্র সত্ত্বা আরও বলেন:

{وهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الحَمْدُ فِي الأُولَى والآخِرَةِ ولَهُ الحُكْمُ وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

"তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ইহলোকে ও পরলোকে প্রশংসা শুধু তারই জন্য।

শাসনের অধিকারও শুধু তারই আর তোমাদেরকে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করানো হবে।"

পবিত্র সত্ত্বা আরও বলেন:

{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}

"শাসন শুধু আল্লাহরই জন্য। আমি তার উপরই ভরসা করেছি আর ভরসাকারীদের তার উপরই ভরসা করা উচিত।"

পবিত্র সত্ত্বা আরও বলেন:

{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}

“জেনে রেখ, শাসন শুধু তারই অধিকার। তিনি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।”

পবিত্র সত্ত্বা আরও বলেন:

{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}

“এভাবে আমি কুরআন অবতরণ করেছি শাসন-বিধান রূপে, আরবী ভাষায়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।”

পবিত্র সত্ত্বা আরও বলেন:

{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}

“আর তিনি তার শাসন কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।”

অতএব এককভাবে আল্লাহ তা’আলার ইবাদত করাই দাবি করে, হালাল ও হারাম করার ক্ষেত্রেও তিনি একক হবেন।

যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন:

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}

“তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় গুরু ও সংসার বিরাগীদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য। যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি তাদের শিরক থেকে পবিত্র।”

এ সকল আয়াতগুলো প্রমাণ করে: শাসন-কর্তৃত্বও ইবাদতে একত্বের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ এটা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা উপাসনার একত্ব।

যে শাসনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে, সে ঐ ব্যক্তির মতই, যে অন্য যেকোন প্রকার ইবাদতে শরীক করে।

আল্লামা শানকিতী রহ: বলেন:

> আল্লাহর শাসন কতৃত্বে কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা আর তার ইবাদতে কাউকে তার সাথে শরীক করা- উভয়টার একই অর্থ। এদু'টোর মাঝে আদৌ কোন পার্থক্য নেই।
>
> সুতরাং যে আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কারো শাসনব্যবস্থার অনুসরণ করে এবং আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কারো বিধান মানে, সে ঐ ব্যক্তির মতই যে, বিতর্কর ইবাদত করে, বিতর্কর জন্য সিজদা করে।
>
> এদু'টির মাঝে কোন দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। তাই উভয়টি একই। উভয়েই আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকারী।
>
> (দেখুন, আযওয়াউল বয়ান লিশ-শানকিতী: ৭/১৬২)

শায়খ রহ: আরও বলেন:

> "তিনি নিজ শাসনে কাউকে অংশীদার বানান না"- এ আয়াত থেকে বুঝা যায়: যারা আল্লাহর বিধানের বাহিরে ভিন্ন বিধান রচনাকরীদের আনুগত্য করে, তারা আল্লাহর সাথে শরীককারী।
>
> এ বিষয়টি অন্য আয়াতে স্পষ্টভাবেই এসেছে: যেমন শয়তান, মৃত প্রাণীকে আল্লাহর জবাইকৃত বলে দাবি করে তা হালাল হওয়ার যে বিধান প্রণয়ন করেছিল, তাতে যারা তার অনুসরণ করেছে, তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে:
>
> ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإِنَّهُ لَفِسْقٌ وإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি, তোমরা তা থেকে খেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা ফিসক (পাপাচার)। শয়তান তার বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে পারে। তোমরা যদি তাদের অনুসরণ কর তাহলে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।”

এখানে আল্লাহ তা’আলা স্পষ্ট করলেন যে, তারা তাদের আনুগত্যের কারণে মুশরিক।

এটা হচ্ছে আনুগত্যের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান মানার ক্ষেত্রে শরীক করা।

আর নিম্নোক্ত আয়াতে শয়তানের ইবাদত বলে এটাই উদ্দেশ্য-

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ}

“হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেই নি যে, তেমারা শয়তানের ইবাদত করবে না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তোমরা আমারই ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ।”

অনুরূপ নবী ইবরাহীম আ: সম্পর্কে আল্লাহর বাণী-

{يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِياً}

“হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।”

(আযওয়াউল বয়ান: ৪/৮৩, ৩/৪৪)

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম বলেন,

এককভাবে আল্লাহর বিধানের শাসন মানা, এটাই আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাক্ষ্যদানের অর্থ। তিনি বলেন: ‘এককভাবে আল্লাহর বিধানের শাসন মানা; অন্য কারো শাসন না মানা, এটাই এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ও অন্য কারো ইবাদত না করার হুবহু অর্থ।

কারণ উভয় শাহাদাতের মূল কথা হচ্ছে: আল্লাহ একমাত্র উপাস্য; তার সাথে কোন শরীক নেই আর আল্লাহর রাসূল সা:ই একমাত্র অনুসরণীয়, তার আনিত বিধানই একমাত্র শাসন-বিধান।

জিহাদের তরবারীগুলো তো শুধু এর জন্যই, এটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কোষমুক্ত হয়েছিল। তথা এটাই মানতে হবে; অন্য সব কিছু বর্জন করতে হবে এবং বিবাদকালে এর ফায়সালাই কার্যকর হবে।

(ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম: ১২/২৫২)

এমনিভাবে আল্লাহর কিতাব থেকে জানা যায়, শাসন-কর্তৃত্ব তাওহীদুর রুবুবিয়াহ তথা বিশ্বাসগত একত্বেরও অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা দ্বারা শাসন করা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (তথা একক রব হিসাবে মানা) এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা আল্লাহর শাসন কার্যকরাটা তার প্রভূত্বেরই দাবি এবং তার রাজত্ব ও ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গতা।

একারণেই আল্লাহ, তার অবতীর্ণ বিধানের বাইরে যাদেরকে অনুসরণ করা হয়, তাদেরকে তাদের অনুসারীদের জন্য রব বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন:

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ والْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً واحِداً لاَّ إِلَهَ إلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}

“তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় গুরু ও সংসার বিরাগীদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামকেও।

অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য। যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি তাদের শিরক থেকে পবিত্র।”

আল্লামা ইবনে হাযাম রহ: আল্লাহ তা’আলার এই বাণী সম্পর্কে বলেন:

> “যেহেতু ইহুদী ও নাসারারা, তাদের ধর্মীয় গুরু ও সংবিরাগীরা যা হারাম করত, তাকে হারাম বলে মেনে নিত এবং তারা যা হালাল করত, তাকে হালাল বলে মেনে নিত, একারণে এটা যথার্থই প্রভূত্ব ও ইবাদত, যা তারা দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করেছিল।
>
> আর আল্লাহ তা’আলা এই আমলটিকে, আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করা ও তাদের ইবাদত করা বলে উল্লেখ করেছেন। আর এটা শিরক হওয়ার ব্যাপারে কোনও মতবিরোধ নেই।”
>
> (ফসল: ৩/২৬৬)

ইবনে তাইমিয়া রহ: এ ব্যাপারে বলেন: আল্লাহ বলেছেন:

> “তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় গুরু ও সংসার বিরাগীদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য। যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি তাদের শিরক থেকে পবিত্র।”
>
> আর আদি ইবনে হাতিমের দীর্ঘ ‘হাসান’ হাদিসে এসেছে: আদি ইবনে হাতিম রা: রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকট আসলেন। তিনি তখন খৃষ্টান ছিলেন। তিনি রাসূল সা: কে এই আয়াত পড়তে শুনলেন। (তিনি বলেন:) তখন আমি বললাম: আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। রাসূলুল্লাহ সা: বললেন: তারা কি আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তাকে হারাম করে না?

আর তোমরাও সেটা হারাম বলে মান না? এবং তারা কি আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেটাকে হালাল করে না? আর তোমরাও তাকে হালাল বলে মেনে নাও না? (তিনি বলেন,) আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: এটাই তাদের ইবাদত।''

এমনিভাবে আবুল বুখতারী বলেন:

''আসলে তারা তাদের জন্য সালাত আদায় করত না এবং তারা যদি তাদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ইবাদত করার আদেশ করত, তাহলে তারা তা মানত না। কিন্তু তারা তাদেরকে হালাল-হারামের ব্যাপারে আদেশ করেছে।

উম্মাহর উপর যেটা হলাল ছিল, সেটাকে হারাম করেছে আর যেটা হারাম ছিল সেটাকে হালাল করেছে। আর এক্ষেত্রে তারা তাদের অনুসরণ করেছে। আর এটাই তাদের প্রভূত্ব।

কারণ রাসূলুল্লাহ সা: স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাদের জন্য তাদের ইবাদত ছিল হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে এবং হালালকে হালাল করার ক্ষেত্রে আনুগত্য করা। এমন নয় যে, তারা তাদের জন্য নামায পড়ত, বা রোজা রাখত বা আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে ডাকত। তাই এগুলোই মানুষের জন্য ইবাদত। আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, এগুলোই শিরক।

আল্লাহ বলেন: [الفتاوى] ({لَّآ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}

''তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করে তিনি তা থেকে পবিত্র।''

ইমাম ইজ্জ ইবনে আব্দুস সালাম রহ: বলেন:

''আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ একক হওয়ার কারণ হল, যেহেতু সৃষ্টি করা, বাচিয়ে রাখা, খাদ্য দেওয়া এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল ব্যবস্থাপনা

একমাত্র আল্লাহরই দান। প্রতিটি কল্যাণ তিনিই দানকারী। প্রতিটি অকল্যাণ তিনিই দূরকারী। এজন্য শাসনই একমাত্র তারই হবে।”

(কাওয়ায়িদুল আহকাম: ২/১৩৪-১৩৫)

আব্দুর রহমান আস-সা’দী বলেন:

রব ও ইলাহ তিনিই, যিনি তাকদিরী, শরয়ী ও প্রতিদান দেওয়া সহ-সর্বপ্রকার শাসনের মালিক, একমাত্র তারই উপাসনা ও ইবাদত করা হয়, তার সাথে কাউকে শরীক করা হয় না, তার নি:শর্ত আনুগত্য করা হয়; কোন প্রকার অবাধ্যতা করা যায় না।

ফলে অন্য সকল আনুগত্যও শুধু তার আনুগত্যের জন্যই হয়।

(আলকাওলুস সাদীদ: ১-২)

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের সামনে একথা স্পষ্ট হয় যে, শাসন-কর্তৃত্বও, প্রভূত্বে একক সাব্যস্ত করারই অন্তর্ভূক্ত।

এবার আপনি এই দলিল নিন যে, এটা ‘নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একক সাব্যস্ত করা’রও অন্তর্ভূক্ত:

আল্লাহ তা’আলা বলেন: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً}

“তাহলে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শাসক (বা ফায়সালাকারী) হিসাবে চাবো?”

মহান আল্লাহ আরও বলেন: {فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ}

“তাই সবর কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।”

মহান আল্লাহ আরও বলেন: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ}

“আল্লাহ কি সর্বোত্তম ফায়সালাকারী (শাসনকারী) নন?”

এখানে আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, শাসন-কর্তৃত্বও, উপাসনায় একক সাব্যস্ত করা,

প্রভূত্বে একক সাব্যস্ত করা এবং নাম ও গুণাবলীতে একক সাব্যস্ত করার অন্তর্ভূক্ত এবং আরও স্পষ্ট করে যে, যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো জন্য এটা নিবেদন করল, সে মহান আল্লার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল।

শাসন-কর্তৃত্ব ঈমানের শর্ত:

অজ্ঞতা ও হঠকারিতা যাদেরকে লাগামহীন করে দিয়েছে তারাই কেবল বলতে পারে, এটা ঈমানের শর্ত নয়। আপনার সামনে দলিল পেশ করা হল:

আল্লাহ তা'আলা বলছেন:

{ يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে উলূল আমর (আদেশদাতা) দেরকে।

আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের পরস্পরে বিরোধ হয়, তাহলে তা আল্লাহর ও তার রাসূলের দিকে ফিরাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"

শরীয়ত প্রণেতা এই শাসনকর্তৃত্ব দেওয়াকে ঈমান হিসাবে গণ্য করলেন।

যেমন অন্য আয়াতে বলেন:

{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}

"না, তোমার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্তা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদেও বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে ফায়সালাকারী বানায়, অত:পর তাদের অন্তরে কোন সংকোচ না থাকে এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।"

ইবনে হাযাম রহ: বলেন:

> "এখানে আল্লাহ নবী সা: কে শাসনকর্তৃত্ব দেওয়াকে ঈমান বললেন। আল্লাহ তা'আলা আরও জানালেন: এটা ছাড়া কোন ঈমান নেই। উপরন্তু তিনি যে ফায়সালা করেন, তার ব্যাপারে অন্তরে কোন সংকোচ থাকতে পারবে না।
>
> সুতরাং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল, ঈমান- আমল, আকীদা ও কথার নাম। কেননা শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া একটি আমল। আর তা কথা ছাড়া বাস্তবায়িত হয় না। আর অন্তরের সংকোচ ছাড়া হতে হবে, তা হচ্ছে বিশ্বাস।"
>
> (আদ্দুররাহ: ২৩৮)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন:

> "একারণেই শরীয়ত তার বিধানের শাসন মেনে নেওয়াকে আবশ্য করেছে এবং এটাকে ঈমানের জন্য শর্ত বানিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}

"আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের পরস্পরে বিরোধ হয়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক।"

আল্লাহ সুবহানাহু অন্য আয়াতে বলেন:

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}

"তোমরা যেকোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে, তার ফায়সালার ভার আল্লাহর উপর।"

শায়খ রহ: আরও বলেন: সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহ, যা দিয়ে আল্লাহ তার নবী সা: কে প্রেরণ করেছেন, তার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারো অধিকার নেই; একমাত্র কাফেরই তার থেকে বের হয়ে যেতে পারে।"

(মাজমূউল ফাতাওয়া: ১১/২৬২)

ইবনে তাইমিয়া রহ: আরও বলেন:

"যে রাসূলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহ ও তার আনিত শরীয়ত থেকে বেরিয়ে যায়, তার ব্যাপারে আল্লাহ স্বীয় পবিত্র সত্ত্বার শপথ করে বলেছেন:

সে কিছুতেই মুমিন হবে না, যতক্ষণ না নিজেদের মাঝে বিবাদমান সকল দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সা: কে ফায়সালাকারী না মানে এবং তার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংকোচ না থাকে।" (আলফাতাওয়া: ২৮/৪৭১)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন:

“{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ..} এর মধ্যে শর্তের পরে নাকিরাহ (অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক শব্দ) এসেছে। যা ব্যাপকতা বুঝায়। তথা মুমিনগণ দ্বীনের ছোট-বড়, স্পষ্ট-অস্পষ্ট যত বিষয়ে মতবিরোধ করে সব অন্তর্ভূক্ত।

এখানে লক্ষণীয়, যদি আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নায় বিবাদমান বিষয়ের সমাধান না থাকত এবং তা ই যথেষ্ট না হত, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি ফিরানোর আদেশ দিতেন না।

কারণ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ এমন বিষয়ের দিকে বিবাদকে ফিরানের আদেশ করবেন, যাতে বিবাদমান বিষয়ের মীমাংসা নেই।

এমনিভাবে আল্লাহ তা’আলা এই ফিরানোকে ঈমানের দাবি ও তার অপরিহার্য বিষয় সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং যখন উল্লেখিত ফিরানো না পাওয়া যাবে, তখন ঈমানও থাকবে না।

যেহেতু কোন জিনিসের অপরিহার্য বিষয়টি না পাওয়া গেলে উক্ত বিষয়টিও পাওয়া যায় না। উপরন্তু এখানে আবশ্যিকীয়তা উভয় দিক থেকে। কোন একটি না থাকলে অপরটি থাকবে না।

তারপর আল্লাহ তা’আলা জানালেন যে, এই ফিরানো তাদের জন্য উত্তম এবং তার পরিণাম উৎকৃষ্ট।”

(ইলামুল মুআক্কিয়ীন:১/৪৯-৫০)

ইমাম ইবনে কাসীর রহ: বলেন:

“সুতরাং আল্লাহ ও তার রাসূল যে ফায়সালা করেন ও যাকে সঠিক বলেন, সেটাই হক। আর হকের পরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া কি আছে?

এজন্যই আল্লাহ তা’আলা বলেন: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ}

অর্থাৎ *বিবাদমান ও অজানা বিষয়কে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ প্রতি ফিরাও।* অত:পর তোমাদের বিবাদমান বিষয়ে তাকে শাসনকারী বা ফায়সালাদানকারী মান।

তাই এটা প্রমাণ করে, যে বিবাদমান বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে ফায়সালাকারী না বানায়, এক্ষেত্রে তার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, সে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়।”

(তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩/২৯)

শায়খ সা’দী এ প্রসঙ্গে বলেন:

“কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি ফিরানো ঈমানের শর্ত। তাই এটা প্রমাণ করে, যে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোকে এদু’টির দিকে না ফিরায়, সে প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়; বরং সে তাগুতের প্রতি ঈমানদার।

যেমনটা আয়াতে এসেছে- {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ... الآية}

কেননা ঈমান, প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর শরীয়তের প্রতি আনুগত্য ও তার শাসনকর্তৃত্ব মেনে নেওয়াকে দাবি করে।

সুতরাং যে নিজেকে মুমিন দাবি করে, আবার আল্লাহর শাসনের বিপরীতে তাগুতের শাসনকে অবলম্বন করে সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।”

(তাফসীরে সা’দী: ২/৯০)

সালাফদের উদ্ধৃতিসমূহ:

১। ইমাম বুখারী রহ: মাসরুক থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেছেন:

> “সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই! আল্লাহর কিতাবের প্রতিটি সূরা কোথায় কোথায় নাযিল হয়েছে, তা আমি জানি এবং কোরআনের প্রতিটি আয়াত কোন্ কোন্ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তাও আমি জানি।
>
> আমি যদি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে আমার থেকে অধিক জ্ঞাত কাউকে জানতাম, যার নিকট উট পৌঁছবে, তাহলে আমি অবশ্যই তার কাছে যেতাম।”

সালিম ইবনে আবুল জা’দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: কে বলা হল, সুহত কি? তিনি বললেন: ঘুষ। তারা বলল, ফায়সালা করার ক্ষেত্রে? তিনি বললেন: *এটা তো কুফর।*
>
> তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন- {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} *“যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসন করে না, ঐ সকল লোক কাফের।”*
>
> ঘটনাটি ইমাম তাবারী, আবু ইয়ালা ও অন্যান্যরাও বর্ণনা করেন। তার থেকে বিশুদ্ধভাবে এটা বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই।

২। ইবনে তাউস থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ইবনে আব্বাস রা:কে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}?

তিনি বলেন: 'এটা কুফর'।

কোন বর্ণনায় এসেছে- 'এটা তার প্রতি কুফর'।

আর কোন বর্ণনায় এসেছে- 'এটাই তার কুফরের জন্য যথেষ্ট'।

(বর্ণনা করেছেন ইমাম আব্দুর রাজ্জাক স্বীয় তাফসীরের ১/১৯১ এ, ইবনে জারির ৬/২৫৬ এ, ওয়াকি আখবারুল কুযাতের ১/৪১ এ এবং অন্যান্যরাও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।)

৩। ইবনে আব্দুল বার রহ: ইসহাক ইবনে রাহওয়াই থেকে বর্ণনা করেন:

"এ ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা হয়েছে যে, যে আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিষয় প্রত্যাখ্যান করে বা কোন নবীকে হত্যা করে আর এমতাবস্থায় সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়কে মৌখিকভাবে স্বীকারও করে, তাহলে সে কাফের।"

(আত্তামহীদ:৪/২২৬)

যেহেতু আমরা জানি, এই ইসহাকই নামায পরিত্যাগকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন, তাহলে কিভাবে তার থেকে নামাযের বিষয়ে বর্ণনা গ্রহণ করা হবে আর শাসনের বিষয়ে গ্রহণ করা হবে না?

ভাই! এই কথাটি চিন্তা করুন, ওখানে বলা হয়েছে: **যদিও এমতাবস্থায় সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়কে মৌখিকভাবে স্বীকার করে।"**

৪। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:৪/৪৪৩- মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

কাযী যখন হাদিয়া গ্রহণ করল, তখন সে ঘুষ গ্রহণ করল।

আর যখন ঘুষ গ্রহণ করল, তখন ঘুষ তাকে কুফরীতে পৌঁছে দিল।

৫। ইমাম শা’বী রহ: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

প্রথমটি মুসলিমদের জন্য, দ্বিতীয়টি ইহুদীদের জন্য এবং তৃতীয়টি খৃষ্টানদের জন্য। অর্থাৎ কুফর।

(কুরআনে কারীমে যারা আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করে না, তাদের ব্যাপারে তিনটি বিশেষণ এসেছে। তা হল যথাক্রমে: কাফিরুন, জালিমুন ও ফাসিকুন। তার প্রতি লক্ষ্য করেই এ কথাটি বলা হয়েছে-অনুবাদক)

৬। তাফসীরে তাবারী: ৬/৫৭- আসবাত ইমাম সুদ্দি থেকে বর্ণনা করেন: তিনি {ومن لم يحكم بما أنزل الله} এর তাফসীর করেন:

“যে আমার অবতীর্ণ বিধানকে শাসন বিধান হিসাবে মানল না; তাকে ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ করল এবং জেনে শুনে অন্য দিকে ঝুকলো, সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত।”

উল্লেখ্য: আসবাত যদিও অনেক বেশি ভুল করেন, কিন্তু তার সততা রয়েছে। এছাড়া এ বর্ণনাটি ইবনে মাসউদ রা: ও মাসরুকের বর্ণনা এবং ইবনে রাহওয়াই এর ইজমারও অনুকূল।

৭। ইবনে হাযাম রহ: বলেন:

“যে ব্যক্তি ইঞ্জিলের এমন কোন বিধান দ্বারা শাসন করে, যে বিধানের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি, সে কাফের, শিরককারী এবং ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত।”

(আলইহকাম ফি উসুলিল আহকাম:৫/১৫৩)

৮। ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন:

আল্লাহ মুহাম্মদ সা: এর উপর যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা শাসন করাই হল ইনসাফ। এটাই ইনসাফের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম প্রকার।

এর দ্বারা শাসন করা রাসূল সা: এর উপর এবং যারা তার অনুসরণ করে তাদের উপর ওয়াজিব। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানকে শিরোধার্য করে না, সে কাফের।

(মিনহাজুস সুন্নাহ: ৫/১৩১)

শায়খ রহ: আরও বলেন:

এটা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ তার রাসূলকে যে আদেশ-নিষেধ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যে তার কোনটা অকার্যকর করে, সে মুসলিম, ইহুদী, নাসারা-সকল জাতির ঐক্যমত্যে কাফের।

(মাজমূউল ফাতাওয়া: ৮/১০৬)

তিনি আরও বলেন: কখনো তারা এরূপ বলে থাকে:

“শরীয়তের বিধি-বিধানগুলো তো হচ্ছে কতগুলো ভারসাম্যপূর্ণ আইন মাত্র, যা মানুষের দুনিয়াবী সুবিধার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।”

পক্ষান্তরে গভীর জ্ঞান, মূলতত্ত্ব, এবং ইহকালীন ও পরকালীন উন্নত স্তরের ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে নবীদের উপর এবং নিজেদের পথকে নবীদের নবীদের পথের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই জানা যায়: এটা ভয়ংকর কুফর ও পথভ্রষ্টতা।

তিনি আরও বলেন: দ্বীনে ইসলাম থেকে এবং সমস্ত মুসলিমদের ঐক্যমত্য থেকে অনিবার্যভাবে এটা জানা যায় যে, যে দ্বীনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের অথবা মুহাম্মাদ সা: এর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন শরীয়তের অনুসরণ করাকে জায়েয মনে করে, সে কাফের।

এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির কুফরের ন্যায়, যে আল্লাহর কিতাবের আংশিকের প্রতি ঈমান আনে আর আংশিকের প্রতি ঈমান আনে না।

(মাজমূউল ফাতাওয়া: ২৮/৫২৪)

৯। ইবনুল কায়্যিম রহ: বলেন:

“অত:পর আল্লাহ সুবহানাহু জানালেন যে, যে রাসূলের আনিত বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিচার করল বা অন্য কিছুর নিকট বিচার প্রার্থনা করল, সে তাগুতকে শাসক বানালো বা তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করল।

আর তাগুত হল, যার ব্যাপারে বান্দা সীমালঙ্ঘন করে, চাই সে উপাস্য হোক বা অনুসৃত হোক বা মান্যবর হোক।

সুতরাং প্রত্যেক কওমের তাগুত হল, তারা আল্লাহ ও তার রাসূল ব্যতীত যাদের নিকট বিচার প্রার্থনা করে, অথবা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে, অথবা যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ ব্যতীত অনুসরণ করে, অথবা এমন বিষয়ে আনুগত্য করে, যে বিষয়ে সে জানে না যে, এতে আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে কি না।”

(ইলামুল মুআক্কিয়ীন:১/৮৫)

১০। ইবনে কাসীর রহ:- {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يُوقنون} "তারা কি জাহিলিয়াতের শাসন কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর শাসন অপেক্ষা উত্তম শাসন আর কি আছে?!-এই আয়াতের তাফফীর প্রসঙ্গে বলেন:

> "যে, সকল কল্যাণের ধারক ও অকল্যাণের অপসারক আল্লাহর সুদৃঢ় বিধান থেকে বের হয়ে যায় এবং মানুষের গড়া ও শরীয়ত থেকে সম্পর্কমুক্ত মতামত ও খেয়াল-খুশির প্রতি প্রত্যাবর্তন করে,
>
> যেমন বর্ববরতার যুগের লোকেরা পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার বিষয়াবলী দ্বারা শাসন করত, সে কাফের; তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে আল্লাহর শরীয়তের শাসনের প্রতি ফিরে আসে; অত:পর কম/বেশি কোন ক্ষেত্রে অন্য কিছুর শাসন না মানে।

তাতার জাতি যে 'ইয়াসিক' বা 'ইয়াসা' নামক সংবিধান দ্বারা শাসন করত, তার কিছু অংশ ইমাম জুওয়াইনীর সূত্রে বর্ণনা করার পর ইবনে কাসীর রহ: বলেন:

> "তাই যখন, যে শেষ নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ সুদৃঢ় শরীয়তকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন রহিত শরীয়তের বিধান দ্বারা শাসন করে, সে কাফের হয়ে যায়,
>
> তখন যে ইয়াসাক দ্বারা শাসন করে এবং তাকে মুহাম্মাদ সা:এর শরীয়তের উপর প্রাধ্যন্য দেয় তার অবস্থা কি হবে?
>
> অতএব যে এমনটা করবে সে মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে।"
>
> (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১২৮)

১১। রিসালাতুত তাওহীদ লিদ দিহলবী:১/১২৯ তে উল্লেখিত,

“আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা শাসন করা এক প্রকার শিরক, আল্লাহ তা’আলার রাজ্য ও রাজত্বে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করণ এবং নিজেদের প্রণীত শরীয়ত দ্বারা আল্লাহর শরীয়তের মোকাবেল করণ।”

১২। আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ শায়খ রহ: বলেন:

যে জানা সত্ত্বেও আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছুর শাসন চায়, সে কাফের।

(আদ্দুরারুস সানিয়্যাহ:২/২৪১)

১৩। শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে হামিদ রহ: বলেন:

যে এমন ব্যাপক ও অপশ্যপালনীয় বিধান পাশ করে, যা আল্লার বিধানের প্রতিদ্বন্ধী, এমন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যাবে। (আহমিয়াতুল জিহাদ: ১৯৬)

১৪। শায়খ সুলাইমান আল উলওয়ান হাফিজাহুল্লাহ বলেন:

ইমাম ইসহাক, ইবনে হাযাম ও ইবনে কাসীর রহ: আলবিদায়া ওয়ান নিহায়ার ১৩ তম খন্ডে চেঙ্গিস খানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এ ব্যাপারে উম্মাহর ঐক্যমত্য বর্ণনা করেন।

আল্লাহ তা’আলা বলেন: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فأولئكَ هُمُ الكَافِرون}... “যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দ্বারা শাসন করে না, ঐ সকল লোক কাফের।”

আর ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত “ছোট কুফর’ এর বর্ণনাটি সঠিক নয়। এটা বিশুদ্ধভাবে তার থেকে প্রমাণিত নয়।

ইমাম হাকিম রহ: মুস্তাদরাকে হাকিমে হিশাম ইবনে হুজাইর এর সূত্রে এটি বর্ণনা করেন। আর হিশাম ইবনে হুজাইর হাদিস রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে যয়ীফ বা দুর্বল। ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া ও আরো একদল

মুহাদ্দিস তাকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। আর উল্লেখিত হাদিসের সূত্র পরস্পরা বর্ণনার ক্ষেত্রে তার বিরোধিতাও করা হয়েছে।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস তার পিতা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণনা করেন, যা হিশামের বর্ণনার বিরোধী।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস হিশাম থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য। সুতরাং হিশামের বর্ণনাটি মুনকার, দলিলের উপযুক্ত নয়।

কিছু আপত্তি ও তার জবাব:

প্রথম আপত্তি

"তারা বলে থাকে, অবশ্যই হালাল মনে করতে হবে"। এটা খুব আশঙ্কাজনক কথা। কারণ আমলের দ্বারাই মানুষকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়; বিশ্বাস পোষণ করা শর্ত নয়। ইবলিশ তো শুধু অহংকারবশত সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর এটা তো আমল।

অনুরূপ নামাযও একটি আমল; যে অস্বীকার করা ছাড়াও তা পরিত্যাগ করে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়, যার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমাও রয়েছে। বিশেষত: যদি স্পষ্ট বর্ণনা আসে যে এই আমলটি পরিত্যাগ করা কুফর, তখন তার মাঝে কোন দ্ব্যার্থতা নেই।

যেমন নামায ও শাসন, এ দু'টির ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। তাই চিন্তা করে দেখুন। উপরন্তু ইসহাক (রহ:) থেকে শাসনের ক্ষেত্রে কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইজমাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত আছে।

প্রকৃতপক্ষে এ কথাটি মুরজিয়াদের কথা।

আপনার সামনে সালাফের বক্তব্য থেকে দলিল পেশ করা হল:

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই বলেন: মুরজিয়ারা সীমালঙ্ঘন করেছে, ফলে তারা একথা বলতে শুরু করেছে যে,

> "যে ফরজ নামায, রমযানের রোজা, যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য ফরজগুলো পরিত্যাগ করে, তবে তা অস্বীকার করে না, আমরা তাকে কাফের বলি না; বরং তার বিষয়টা আল্লাহর দিকে সঁপে দিতে হবে। শর্ত হল, যদি সে স্বীকারকারী হয়"- এ সকল লোকের মুরজিয়া হওয়ার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।" (ফাতহুল বারী লিইবনে রজব:১/২৩)

‘আস-সুন্নাহ লি আব্দিল্লাহ ইবনে আহমাদ’ এ সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আলহারাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

> “আমরা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে মুরজিয়াদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন: মুরজিয়া হল, যারা এমন ব্যক্তির জন্যও জান্নাত সাব্যস্ত করে, যে মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য দেয়; অথচ অন্তরে শরীয়তের ফরজগুলো তরক করার ব্যাপারে অনড় থাকে।
>
> তারা ফরজগুলো পরিত্যাগ করাকে শুধু গুনাহ বলে। যেমন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া গুনাহ। অথচ উভয়টি সমান নয়। কেননা হালাল মনে না করে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া হল গুনাহ। আর কোন ওযর বা অজ্ঞতা ছাড়া ইচ্ছাকৃত ফরজগুলো পরিত্যাগ করা হল কুফর।”
>
> (আস-সুন্নাহ:১/৩৪৭)

দ্বিতীয় আপত্তি

তা হল ইবনে আব্বাস রা: এর বর্ণনাটি: তিনি বলেন: ‘এটা হচ্ছে ছোট কুফর’। আরেক বর্ণনায় এসেছে, ‘এটা এমন কুফর নয়, যার বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যুদ্ধ করবে’। আরেক বর্ণনায় এসেছে, ‘এটা ঐ ব্যক্তির কুফরের মত নয়, যে আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ ও তার কিতাবসমূহের প্রতি কুফরী করে’।

একাধিক বর্ণনায় এরূপ এসেছে। এর কয়েকটি জবাব:

প্রথমত: সাহাবায়ে কেরামের মাঝেই এর বিপরীত মতের প্রবক্তা পাওয়া যায়। (এ উত্তরটি হচ্ছে যদি তার থেকে এ বর্ণনাটি সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়। আর নিশ্চিতভাবেই বর্ণনাটি সঠিক নয়। যার আলোচনা সামনে আসবে।)

তিনি হলেন ইবনে মাসউদ রা:। আর রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন: *উম্মে আবদের পুত্র (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ) আমার উম্মতের জন্য যে বিষয়ে সন্তুষ্ট, আমিও তাতে সন্তুষ্ট।*

ইবনে মাসুদ রা: বলেছেন: *"সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই! আল্লাহর কিতাবের প্রতিটি সূরা কোথায় নাযিল হয়েছে, আমি তা জানি এবং প্রতিটি আয়াত কোন্ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তাও আমি জানি।*

আমি যদি কাউকে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে আমার থেকে অধিক অবগত জানতাম, যার নিকট উট পৌঁছবে, তাহলে আমি অবশ্যই সেখানে পৌঁছে যেতাম।" তিনি আল্লাহর শপথ করে বললেন, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে তার থেকে অধিক অবগত কাউকে তিনি জানেন না।

দ্বিতীয়ত: ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত ইজমা, যা এই রেওয়ায়াতের বক্তব্যের বিপরীত।

তৃতীয়ত: আল্লাহর কিতাবের ইঙ্গিতসমূহ। যা প্রমাণ করে, তাতে কুফর দ্বারা বড় কুফর উদ্দেশ্য। ছোট কুফর নয়; কারণ এটা এমন একটি ইবাদত, যা মুল তাওহীদের অন্তর্ভূক্ত। আর কুফর শব্দের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, তা যখন 'আলিফ লাম' সহ আসে, তখন বড় কুফর উদ্দেশ্য হয়।

যেমনটা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: আলইকতিযায় বলেছেন। তবে যদি তা শর্তযুক্ত থাকে বা তাতে এমন কোন আলামত থাকে, যা তাকে উক্ত অর্থ গ্রহণ করতে বাঁধা দেয় তবে ভিন্ন কথা।

শায়খ রহ: আরও বলেন: *আরবি ভাষায় 'আলিফ লাম' যুক্ত হয় নির্দিষ্ট করণের জন্য। অতএব যেটা বক্তা ও সম্বোধিত ব্যক্তি- উভয়ের জানা, সেই অর্থই উদ্দেশ্য হবে।*

অর্থাৎ বক্তা ও সম্ভোধিত ব্যক্তির জানা ও পরিচিত সব বিষয় এর অন্তর্ভূক্ত হবে। তাই কোন কথার মধ্যে 'লাম' ব্যাপকতা ও সামগ্রীকতা বুঝায়। কিন্তু শুধু জানা বিষয়গুলোরই ব্যাপকতা। তথা বক্তা ও সম্ভোধিত ব্যক্তির জানা ও পরিচিত কথাটি উদ্দেশ্য হবে। (আল ইস্তিকামা:১/২২২)

চতুর্থত: এটা হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান ও মূলকথা এবং ইবনে আব্বাস রা: থেকে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত রেওয়ায়াত (বর্ণনা) গুলোর ব্যাপারে সব জঞ্জালমুক্ত সারকথা। তাই শীর্ণকায় থেকে পুষ্টকে এবং ঘোলাটে থেকে স্বচ্ছকে পৃথক করার জন্য এটাই উপযুক্ত।

সুতরাং আমরা এর সনদগুলোর ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নীতির আলোকে নির্ভরযোগ্য ইলমী পর্যালোচনা করব।

এতে আমরা আমাদের পক্ষের-বিপক্ষের উভয় দিকের রিওয়ায়াতগুলো আনবো। আর তাওফীক আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

প্রথম রেওয়ায়াত: যে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার করে সে কাফের। আর যে তা বহাল রাখে, তবে তার দ্বারা শাসন বা বিচার করে না সে জালিম ও পাপিষ্ঠ।

ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন: "যে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে স্বীকার করে, তবে তা দ্বারা শাসন করে না, সে জালিম ও পাপিষ্ঠ।"

আমরা বলবো: এই বর্ণনাটি ইমাম তাবারী রহ: জামিউল বয়ানের ৬/১৬৬ এ এবং ইবনে আবি হাতিম তার তাফসীরের ৪/১১৪২ এ উল্লেখ করেছেন।

হাদিসটির সূত্র হচ্ছে: ইবনে জারির আত তাবারি আল মুসান্না হতে, আল মুসান্না আবদুল্লাহ বিন সালিহ হতে, তিনি মুআবিয়া ইবনে সালিহ হতে, মুয়াবিয়া বিন সালিহ ইবনে আবি তালহা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে।

এই সনদটি দু'টি দোষে দোষযুক্ত:

প্রথম দোষ: আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ যয়ীফ। আলেমগণ তার ব্যাপারে যা বলেছেন তার বিবরণ:

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন: আমি আমার পিতাকে লাইস ইবনে সা'দের কাতিব আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেন: তিনি প্রথম দিকে দৃঢ় ছিলেন, পরে নষ্ট হয়ে যান। আর এখন তার কোন নির্ভরযোগ্যতাই নেই। আলী ইবনুল মাদিনী বলেন: আমি তার থেকে কিছু বর্ণনা করি না। ইমাম নাসায়ী রহ: বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আহমাদ ইবনে সালিহ বলেন: তিনি অভিযুক্ত; তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সালিহ জাযরাহ বলেন: ইবনে মায়ীন তাকে ছিকা (নির্ভারযোগ্য) বলতেন, কিন্তু আমার মতে সে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে।

আবু যুরআ বলেন: তিনি আমার নিকট ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত নন, যারা ইচ্ছকৃত মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে। তার হাদিস উত্তম।

আবু হাতিম বলেন: আমি তাকে যতটুকু জানি, তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।

আমরা দেখতে পেলাম, ইমাম আহমাদ, আলী ইবনুল মাদিনী, নাসায়ী, আহমাদ ইবনে সালিহ ও সালিহ আলজাযরাহ এর মত বড় বড় ইমামগণ তাকে যয়ীফ বলেছেন।

দ্বিতীয় দোষ: ইবনে আবি তালহা ও ইবনে আব্বাসের মাঝে ইনকিতা বা বিচ্ছেদ। তাই ইবনে আবি তালহা তার থেকে শুনেনি। ইবনে মায়ীন, দুহাইম, ইবনে হিব্বান ও অন্যান্য ইমামগণ এমনটাই বলেছেন।

আর কেউ কেউ যেটা বলে- 'তাদের মধ্যস্ত হলেন মুজাহিদ ও ইকরিমা', এটা দু'টি কারণে সঠিক নয়:

প্রথম কারণ: মুজাহিদ ও ইকরিমা থেকে তার শ্রবণ সাব্যস্তকারী মাজহুল বা অজ্ঞাতপরিচয়। ইমাম মিয্যী রহ: তাহযীবুল কামালে এ সনদটি উল্লেখ করে বলেন: "তাদের মধ্যস্ত হলেন মুজাহিদ।"

কিন্তু তিনি এ কথাটিকে ইবনে আবি তালহার সমকালীন কোন আলিমের দিকে বা সনদ সমালোচক কোন ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করেননি।

আর ইমাম তাহাবী রহ: থেকে মুশকিলুল আসারে যা এসেছে, তাতে আদৌ খুশি হওয়ার কিছু নেই, কারণ তিনি এটাকে কতক আলেমের দিকে সম্পৃক্ত করেন, কিন্তু তাদের কারো নাম উল্লেখ করেন নি।

> বরং তিনি নিজেই এ ধরণের বর্ণনার সমালোচনা করেছেন। দেখুন, তার বক্তব্য: "ইবনে আব্বাস রা:এর যে বর্ণনাটি আমরা এ কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করলাম তার সূত্র যদিও মুনকাতি (মাঝে কাটা), যা প্রমাণযোগ্য নয়, কিন্তু হাদিস বিশেষজ্ঞদের একদল এটাকে সহীহ বলেছেন। আর আলী ইবনে আবি তালহা যদিও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা:কে দেখেননি, কিন্তু তিনি ইবনে আব্বাসের আযাদ করা গোলাম ইকরিমা ও মুজাহিদ থেকে তা গ্রহণ করেছেন।"
>
> (শরহে মাআনিল আসার: ৩/২৭)

আমি বলবো: তিনি কি হাদিস বিশেষজ্ঞদের এমন কারো নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি ইবনে আবি তালহার সমকালীন এবং যিনি তাকে ভালভাবে চিনতেন। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দিকে শুধু সম্পৃক্ত করাই কি দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য?

আমরা জানতে পারলাম, উপরুক্ত বর্ণনায় তাহাবী রহ: বলেছেন: "তার সূত্র যদিও মুনকাতি, যা প্রমাণযোগ্য নয়"।

এর দ্বারা তার ইবনে আবি তালহা ও ইবনে আব্বাসের মধ্যকার ইনকিতা (বিচ্ছেদ)ই উদ্দেশ্য। অতএব নিশ্চিত নিশ্চতই তার থেকে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি।

মধ্যস্থতার কথা সঠিক না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ: দৃঢ়চিত্ত ইমামদের বক্তব্য থেকে শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। যেমন: সালিহ ইবনে মুহাম্মদ যখন ইয়াকুব ইবনে ইসহাককে জিজ্ঞেস করলেন: ইবনে আবি তালহা কার থেকে তাফসীর শ্রবণ করেছে?

তখন তিনি সহীফা (তথা তাফসীরে ইবনে আব্বাস) শ্রবণ না করার ব্যাপারে এভাবে খাস করে বলেন: "কারো থেকে নয়"।

(দেখুন, তাহযীবুল কামাল: ২/৯৭৪)

সুতরাং কোন নিশ্চিত দলিল ছাড়া এর বিপরীত হবে না। কারণ এটা স্বীকৃত কথা যে, নিশ্চিত বিষয় সন্দেহপূর্ণ বিষয় দ্বারা রহিত হয় না।

আর কেউ কেউ যা বলে: এটা 'ওয়িজাদাহ' (কারো থেকে লিখিত পাওয়া সূত্রে বর্ণনা)। এটা মাকড়সার বাসা থেকেও দুর্বল কথা; কেননা ওয়িজাদাহ এর শর্তসমূহ তাতে আদৌ পাওয়া যায় না।

এটা পর্যালোচনারও যোগ্য নয়; কারণ এটা হল নিজ খুশিমত একটি কথা বলে দেওয়া। সুতরাং এর উপযুক্ত পাওনা হল, এটাকে ফেলে দেওয়া।

এছাড়া এই আলী ইবনে আবি তালহা মুনকার হাদিসসমূহও বর্ণনা করে থাকেন। তিনি এই সহীফায়ই অনেক মুনকার হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ইবনে আব্বাস রা: এর সকল ছাত্রদের থেকেই এমন হাদিস বর্ণনা করতেন, যেগুলোর উপর তার প্রতিবাদ করা হত এবং যেগুলো তিনি একাই বর্ণনা করতেন। আপনার সামনে কয়েকটি দলিল পেশ করছি:

ইমাম বাইহাকী রহ: আল-আসমা ওয়াস সিফাতের ৮১ নং পৃষ্টায় এবং ইমাম লালিকায়ি ইতিকাদু আহলিস সুন্নার ২/২০১ এ আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ এর সূত্রে, তিনি মুআবিয়ার সূত্রে, তিনি আলী ইবনে আবি তালহার সূত্রে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ} আয়াতটির ব্যাপারে বর্ণনা করেন:

“এখানে বলা হচ্ছে: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আসমান ও যমীনবাসীদের পথপ্রদর্শনকারী। {مَثَلُ نُورِهِ}অর্থাৎ মুমিনের অন্তরে তার হেদায়াতের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন স্বচ্ছ তেল এ আগুনের স্পর্শ লাগার পূর্বেই তা আলোকিত করে তুলে। অত:পর যখন আগুনের স্পর্শ লাগে, তখন আলো আরও বহুগুণে বেড়ে যায়।

আরেকটি বর্ণনা, যা ইমাম তাবারী রহ: তার তাফসীরে (৮/১১৫) একাধিক জায়গায় এবং ইমাম বাইহাকী রহ: তার ‘আলআসমা ওয়াস সিফাত’ এর ৯৪ পৃষ্ঠায় একই সনদে মারফূসূত্রে উল্লেখ করেছেন, নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর ব্যাপারে: {المص}، {كهيعص}، {طه}، {يس}، {ص}، {طس}، {حم}، {ق}، {ن}،

“এগুলো কসম, আল্লাহ তা’আলা এগুলোর শপথ করেছেন। এগুলো আল্লাহ তা’আলার একেকটি নাম।”

এটি একটি মুনকার হাদিস। সুবহানাল্লাহ! কোন জ্ঞানী মানুষের নিকট কিভাবে এগুলোকে সঠিক মনে হতে পারে? কোন মানুষ কি শুনেছে ক্বাফ, সা’দ, নূন- এগুলো আল্লাহর নাম?

অর্থাৎ যখন আপনি আল্লাহকে ডাকবেন, তখন বলবেন হে ক্বাফ! হে সা’দ! আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অনুরূপ ইবনুল হাকাম বর্ণনা করেছেন, যেটা ইমাম সুয়ূতী রহ: আল ইতকানে [২/১৮৯] তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

তা হচ্ছে: "ইমাম শাফেয়ী রহ: বলেছেন: ইবনে আব্বাস রা: থেকে তাফসীরের ব্যাপারে মাত্র ১০০ হাদিস প্রমাণিত"। আমি বলবো: এটা কিভাবে? শুধু সহীফা (সহীফায়ে ইবনে আব্বাস) এ ই তো ১৪০০ এর অধিক রিওয়ায়াত?

তাই মোটকথা হল, হাদিস সমালোচক মুহাদ্দিসদের নীতির আলোকে এই রেওয়ায়াতটি কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না। যা এখন প্রত্যেক সত্যন্বেষী ও সঠিক পথের অনুসারীর নিকট স্পষ্ট।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত: ঐ ব্যক্তির কুফরীর ন্যায় নয়, যে আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ ও তার রাসূলগণের সাথে কুফরী করে।

এটাকে একটি সংকটপূর্ণ রেওয়ায়াত হিসাবে গণ্য করা যায়। এটা ইবনে তাউস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী- {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} এর ব্যাপারে তিনি বলেন: এটা তার সাথে কুফরী। তবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর নবীদের সাথে কুফরীর মত নয়।

ইমাম তাবারী রহ: এর তাফসীরেও যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেখানে ইবনে আব্বাস রা: এর এ কথাটি আনা হয়েছে। কারণ তার নিকট এর দোষ প্রকাশিত ছিল না। তার সূত্র হচ্ছে: সুফিয়ান, মা'মার ইবনে রাশেদ থেকে, তিনি ইবনে তাউস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস রা: থেকে।

এই বর্ণনায় এটা আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস রহ: এর কথা হিসাবে এসেছে। কিন্তু উলূমে হাদিসের নীতি অনুসারে তার ব্যাপারে আমরা বলবো: এটা তো ইবনে তাউসে বক্তব্য; ইবনে আব্বাস রা: এর বক্তব্য নয়। তাই এটা মুদরাজ (তথা মাঝে সংযুক্ত)। আর এর দলিল কয়েকটি:

প্রথম দলিল: ইবনে আব্বাস রা: এর কথার সাথে এই অতিরিক্ত কথাটি যিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি হচ্ছেন সুফিয়ান। তিনি বর্ণনা করেছেন মা'মার ইবনে রাশেদ থেকে। আর ইমাম আব্দুর রাজ্জাক এক্ষেত্রে তার থেকে ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি এর ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন: "এটা ইবনে তাউসের বক্তব্য"।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন: "আমাদের নিকট মা'মার, ইবনে তাউস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: ইবনে আব্বাস রা: কে আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল: {فأولئك هم الكافرون}؟ তিনি বলেন: 'এটা আল্লাহর সাথে কুফরী'।

ইবনে তাউস বলেন: তবে ঐ ব্যক্তির কুফরীর ন্যায় নয়, যে আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ ও তার রাসূলগনের সাথে কুফরী করে"। সুতরাং স্পষ্ট হল, এটা ইবনে তাউসের বক্তব্য; ইবনে আব্বাস রা: এর বক্তব্য নয়।

দ্বিতীয় দলিল: হাদিসের ইমামগণ বলেছেন: যখন মা'মারের ছাত্রদের মধ্যে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) হয়, তখন আব্দুর রাজ্জাকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটা বলেছেন আব্দুর রাজ্জাকের সমকালীন ও তার ব্যাপারে সম্যক অবগত, হাদিস ও রাবি সমালোচক ইমাম সানআনী রহ:।

তখন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাহল ইবনে আসকার বললেন: আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি: যখন মা'মারের ছাত্রদের মাঝে মতবিরোধ হয়, তখন আব্দুর রাজ্জাকের হাদিসটি গ্রহণযোগ্য হবে। (তারীখু আসমাউস সিকাত: ১/১৮০০)

এমনিভাবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ:ও মা'মার থেকে আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়াতকে, মা'মার থেকে আব্দুল আলার রেওয়ায়াতের উপর প্রাধ্যান্য দিয়েছেন।

আর আপনি কি জানেন আব্দুল আলা কে? তিনি এমন নির্ভরযোগ্য, যে, মুহাদ্দিসদের ব্যাপক সংখ্যক লোক তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এবার আপনি আমাদের কথার দলিল নিন:

হাফেজ রহ: বলেন: "ইমাম নাসায়ীর নিকটও মা'মার থেকে আব্দুল আলার সূত্রে বর্ণিত যুহরীর হাদিসের মধ্যে বকরী ও মুরগীর মাঝে হাঁসের বর্ধনের মত মনে হয়েছে। কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক এর থেকে ভিন্ন রকম বর্ণনা করেছেন।

আর মা'মার থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে আব্দুল আলার তুলনায় তিনিই অধিক দৃঢ়। এ কারণে তিনি তা (আব্দুল আলার বর্ণনা) উল্লেখ করেননি"।

(ফাতহুল বারী: ২/৩৬৮)

একারণে ইবনে আব্দুল বার রহ: এটাকে আরো দৃঢ় করে বলেন: 'আবান' গ্রহণযোগ্য নয়। আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনার উপর তার সংযোজন গ্রহণ করা হবে না। কারণ মা'মার থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে আব্দুর রাজ্জাকই সর্বাধিক দৃঢ়। (আত্তামহীদ: ৬/৪১০)

যদিও আমরা জানি, আবান নির্ভরযোগ্য; তাকে সত্যায়নকারীও অনেক আছে এবং তিনি সহীহাইনের রাবী।

আব্বাস আদ্দাওরী ইবনে মায়ীন থেকে বর্ণনা করেন: *"মা'মারের হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আব্দুর রাজ্জাকই সর্বাধিক মজবুত"।* (তাহযীবুত তাহযীব: ৬/২৭৯)

ইয়াকুব ইবনে শুআইব বলেন: "মা'মারের হাদিসের ক্ষেত্রে আব্দুর রাজ্জাকই অধিক মজবুত ও উত্তম সংরক্ষণকারী।

তাই সুহৃদ পাঠকগণ! দেখুন, ইমাম আহমাদ, ইবনে মায়ীন, ইবনে আব্দুল বার, ইয়াকুব ও ইবনে হাজারের মত বড় বড় ইমামগণ আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়াতকে অন্যদের তুলনায় কিরূপ প্রাধান্য দিলেন! আর দেখুন, মুরজিয়াদের

মাযহাব সমর্থনকারীরা কিভাবে ইমামদের বিরোধিতায় মরণপণ লেগেছে! তাই আল্লাহই আশ্রয়।

তৃতীয় দলিল: বিশুদ্ধ ও সুপ্রমাণিত রেওয়ায়াত হল আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়াত। যাতে নি:শর্তভাবে বলা হয়েছে "এটা আল্লাহর সাথে কুফরী"। যাতে সুফিয়ানের রেওয়ায়াতের অতিরিক্ত কথাটি নেই। এটাই ইমাম আহমাদ, ইবনে মায়ীন, ইয়াকুব, ইবনে আব্দুল বার ও ইবনে হাজার রহ: দের বক্তব্যের দাবি।

চতুর্থ দলিল: মুদরাজ (সংযুক্তিপূর্ণ হাদিস) প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ যে বিবরণ পেশ করেছেন, তা এই রেওয়ায়াতে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। ইমাম যাহাবী রহ: বলেন: মুদরাজ হল এমন শব্দাবলী, যা কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে মূল হাদিসের মাঝে যুক্ত হয়, শ্রোতার নিকট মনে হবে, এটা মূল হাদিসেরই অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কোন প্রমাণ দ্বারা বোঝা যাবে, এটা বর্ণনাকারীর শব্দ এবং হাদিসটির কোন সনদে একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হবে যে, এতটুকু হাদিসের শব্দ আর এতটুকু বর্ণনাকারীর শব্দ।

আর এই রেওয়ায়াতের এমন সনদ রয়েছে, যা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং উক্ত সনদটি অপর রেওয়ায়াতের সনদ থেকে অধিক মজবুত ও শক্তিশালীও। উক্ত রেওয়ায়াতের সারকথা হল: এটা ইবনে তাউসের বক্তব্য, যা সংযুক্ত করা হয়েছে; ইবনে আব্বাস রা: এর থেকে মুক্ত।

তৃতীয় রেওয়ায়াত: মূল কুফরের চেয়ে ছোট কুফর।

ইমাম মারওয়াযী রহ: 'তাযিমু কাদরিস সালাহ' এর ২/৫২১ এ ইবনে আব্বাস রা: থেকে এটি বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম রহ: মুস্তাদরাক এর ২/৩১৩ এ হিশাম ইবনে হুযায়র থেকে, তিনি তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণনা করেন: "এটা এমন কুফর নয়, যার বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যুদ্ধ করবে।

এটা এমন কুফর নয়, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। {فأولئك هم الكافرون} এটা মূল কুফরের চেয়ে ছোট কুফর। আর কেউ আরও বৃদ্ধি করে বলেছে: এটা মূল জুলুমের চেয়ে ছোট জুলুম, মূল ফিসক থেকে ছোট ফিসক।"

এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। এর সনদের মাঝে হিশাম ইবনে হুজাইর রয়েছে, যাকে ইমাম আহমাদ, ইবনে মায়ীন ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। আর তিনি একাই এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর কেউ বর্ণনা করেনি।

তাই এ বর্ণনাটি দুই কারণে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত):

প্রথম কারণ: হিশাম এককভাবে এটা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ: তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তার বিরোধিতা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস, যিনি তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য- তিনি তার বিরোধিতা করেছেন। আর ইবনে তাউসের বর্ণনা বিভিন্ন শব্দে এসেছে।

যেমন: 'এটা কুফর', কোথাও এসেছে, 'এটা তার সাথে কুফরী', কোথাও এসেছে, 'এটাই তার কুফরীর জন্য যথেষ্ট'।

আব্দুর রাজ্জাক তার তাফসীরের ১/১৯১ এ, ইবনে জারীর তার তাফসীরের ৬/২৫৬ এ, ওয়াকি 'আখবারুল কুযাতের ১/৪১ এ এবং অন্যান্য ইমামগণ সহীহ সনদে এটা বর্ণনা করেছেন।

আর সেগুলো নি:শর্ত ও স্পষ্ট; ইবনে হুজাইর যে বৃদ্ধি করেছে, সেগুলোতে তা নেই। অতএব স্পষ্ট হল যে, এ বর্ণনাটিও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। তাই এটা প্রত্যাখ্যাত, প্রমাণের যোগ্য নয়।

চতুর্থ রেওয়ায়াত: এমন কুফর নয়, যার বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যুদ্ধ করবে।

এমন কুফর নয়, যার বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যুদ্ধ করবে। এটাও হিশাম ইবনে হুজাইর এর সূত্রে। অনেক ইমামগণ তাকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। আলী ইবনুল

মাদিনী বলেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আলকাত্তানের নিকট পাঠ করতে লাগলাম: জুরাইজ আমাদের নিকট হিশাম ইবনে হুজাইর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন... তখন ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ বললেন: এটা ফেলে দেওয়াই উপযুক্ত। আমি বললাম, তার হাদিস ছুড়ে মারবো? তিনি বললেন: হ্যাঁ।

ইবনে আদি বলেন: মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের বরাবর লিখা হয়েছে: আমাদের নিকট আমর ইবনে আলি বর্ণনা করেন, আমি ইয়াহইয়াকে শুনেছি, তাকে হিশাম ইবনে হুজাইর এর হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করতে নিষেধ করলেন এবং তাকে সমর্থন করলেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন: আমি ইয়াহইয়াকে হিশাম ইবনে হুজাইর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাকে খুব যয়ীফ সাব্যস্ত করলেন। তিনি আরও বললেন: আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি: হিশাম ইবনে হুজাইর মক্কী, হাদিসের ক্ষেত্রে সে দুর্বল।

পক্ষান্তরে ইবনে হিব্বান, ইবনে সা'দ, ইবনে শাহীন ও আজালীর ন্যায় ইমামদের পক্ষ থেকে তাকে যে সমর্থন করা হয়েছে, তা ইমাম আহমাদ, ইবনুল মাদিনী ও ইবনে সায়ীদ এর ন্যায় হাদিস সমালোচক ইমামদের সামনে কিছুই না, কারণ এ ধরনের মতবিরোধের ক্ষেত্রে তাদের কথার উপর নির্ভর করা হয়। তাই তারা হলেন, এই শাস্ত্রে পুরো দুনিয়ার ইমাম। বিশেষত: যেহেতু হিশাম এটি এককভাবে বর্ণনা করেছে। আর এক্ষেত্রে কেউ তার অনুসরণ করেনি।

এ কারণেই সুফিয়ান রহ: হিশাম থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে ওযর পেশ করে বলেন: "আমরা তার থেকে শুধু এমন হাদিসই গ্রহণ করেছি, যেটা অন্য কারো থেকে পাইনি"। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সুফিয়ান হিশাম থেকে যত হাদিস বর্ণনা করেছেন, সবগুলোই এধরণের। তাহলে কিভাবে তার মুতাবাআত (অনুসরণ কওে রেওয়ায়াত করা) এর দাবি করা যায়?

পঞ্চম রেওয়ায়াত: এমন কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে না।

এটি একটি দুর্বল বর্ণনা। এটা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: "আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেন আব্দুর রাজ্জাক, সুফিয়ান থেকে, তিনি এক ব্যক্তি থেকে, উক্ত ব্যক্তি তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে.. আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে- {فأولئك هم الكافرون}তিনি বলেন: 'এটা এমন কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে না'।" এখানে অস্পষ্টতা প্রকাশ্য।

তাহলে স্থির হল, ইবনে আব্বাস থেকে যেটা কোন সন্দেহ ছাড়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং যাতে কোন আপত্তির অবকাশ নেই তা হল: "এটা তার সাথে কুফরী"। যা আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্য ইমামগণ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যাতে কোন সন্দেহের স্পর্শ নেই। সুতরাং এটাই হল মূল ও নিখুত। এর দ্বারাই থেকে ইবনে আব্বাস রা: এর অবস্থান সুনির্ধারিত হয়। আর তাউস থেকে এর বিপরীত যা বর্ণিত হয়েছে তা পূর্ববর্তী ইজমা ভাঙ্গতে পারবে না।

পঞ্চমত: যেহেতু এই বর্ণনাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহন করে, সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়, শরীয়তের নীতি বর্ণনা করে এবং বাহ্যিকের বিপরীত ব্যাখ্যা কওে, তাহলে তো উচিত ছিল, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ, আবু দাউদ, তায়ালেসী সহ বহু সংখ্যক ইমাম এবং সুনান, মুসনাদ ও মু'জামের মুসান্নিফগণ তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বেন এবং এর চূড়ান্ত গুরুত্বের কারণে কোন একটি তাফসীর থেকে এটা বাদ পড়বে না। কিন্তু তা তো দেখা যায় না।

বরং ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এর বিপরীত ইজমা বর্ণনা করেছেন। তাহলে তাদের সকলের এর থেকে বিমূখীতা খুবই আশ্চর্যজনক। যদিও ইমাম আহমাদ রহ: তার কিতাবুল ঈমানে হিশামের সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন, যাকে তিনি নিজেই যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন।

এমনিভাবে সায়ীদ ইবনে মানসুর, ইবনে বাত্তা, হাকিম, বাইহাকী, মারওয়াযীও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ এর মুসান্নিফদের এর থেকে বিমূখীতা খুবই আশ্চর্যজনক ও সন্দেহপূর্ণ। যা এর দুর্বলতা নিশ্চিত করে।

আর এই জবাব নিজের জন্য বা নিজের মাযহাবের জন্য বা নিজস্ব চিন্তাধারা বাস্তবায়নের স্বার্থে দেওয়া হচ্ছে না। কেননা বান্দা ও তার সৃষ্টিকর্তার মাঝে ভুল বোঝা পড়ার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন মাযহাবের পক্ষে জবাব দেওয়া আদৌ দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়।

তৃতীয় আপত্তি:

খতীব বাগদাদী রহ: তারিখে বাগদাদে ১০/১৮৬ এ বর্ণনা করেন, হাসান ইবনে খিজির বলেন: আমি ইবনে আবি দাউদকে বলতে শুনেছি:

জনৈক খারিজী লোককে খলীফা মামুনের সামনে উপস্থিত করা হল।

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি কারণে আমাদের বিরোধিতা কর? সে বলল: আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতের কারণে। তিনি বললেন: কোন আয়াত? সে বলল: এই আয়াত- {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} তখন মামুন তাকে বললেন: তুমি কি এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে জান?

সে বলল: হ্যা। মামুন বললেন: এর পক্ষে তোমার দলিল কি? সে বলল: উম্মাহর ইজমা। মামুন বললেন: তাহলে যেমনিভাবে তুমি এর অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা মেনে নিয়েছ, তেমনিভাবে এর তাবিলের (ব্যাখ্যার) ব্যাপারেও ইজমা মেনে নাও।

তখন সে বলল: আপনি সত্য বলেছেন। আপনার প্রতি সালাম হে আমীরুল মুমিনীন!

আমরা বলবো: এটা প্রমাণিত নয়। এর সনদের এক স্তরে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে দুরাইদ ইবনে আতাহিয়া আবু বকর আযদী রয়েছে।

আবু বকর আলআযহারী আল লাগবী বলেন: আমি ইবনে দুরাইদের নিকট গিয়ে তাকে মাতাল অবস্থায় দেখেছি। (লিসানুল মিযান: ৫/১৩৩)

আমি বলবো: সুদৃঢ় ইমামদের থেকে বর্ণিত সালাফের ইজমার বিপরীতে এই ইজমা বর্ণনা করার দ্বারা তার কি উদ্দেশ্য! তা আল্লাহই ভাল জানে।

আবু বকর আলহারাবী বলেন: আমি ইবনে শাহীনকে বলতে শুনেছি: "আমরা ইবনে দুরাইদের নিকট গিয়ে তার অবস্থা দেখে লজ্জাবোধ করতাম। সেখানে কতগুলো কাঠ ঝুলানো থাকত আর তাতে থাকত স্বচ্ছ মদ।

অথচ তার বয়স নব্বই ছাড়িয়েছে"। মুসলিমা ইবনে কাসিম বলেন: তিনি ইতিহাস, ঘটনাবলী ও বংশ নিয়ে বেশি বর্ণনা করতেন। তবে তিনি মুহাদ্দিসীনের নিকট নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। আর তিনি ছিলেন চরিত্রহীন। (উপরের সূত্র)

চতুর্থ আপত্তি:

কেউ কেউ দলিল দেয়, *"নাজ্জাশী মুসলিম ছিলেন, রাসূল সা: তার মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়েছেন। আর তিনি ছিলেন একজন বাদশা ও শাসক; জনগণকে খৃষ্টীয় ধর্মমত দ্বারা শাসন করতেন।"*

আল্লাহর শপথ! এটা সবচেয়ে ভয়ংকর দলিল। কারণ এর আবশ্যকীয় অর্থ হচ্ছে: খৃষ্টধর্ম বা অন্যান্য ধর্ম দ্বারা শাসন করা জায়েয আছে এবং এর তার দ্বারা শাসনকারী ব্যক্তি নেককারও।

কারণ রাসূল সা: নাজ্জাশী সম্পর্কে বলেছেন: *সে একজন নেককার লোক।*

আল্লাহ মুরজিয়াবাদকে ধ্বংস করুন! তা মুরজিয়াদেরকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে! এদের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যায়:

প্রথম জবাব: এই দলিলের অনিবার্য ফলাফল হল: খৃষ্টীয় ধর্মমত দ্বারা শাসন পরিচালনা করা জায়েয আছে। যদি মেনে নেই যে, নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণের পরও তার দ্বারা শাসন করেছেন। এ তো এমন ধূর্ত লোকের কারবার, যার পট্টি লাগানোর কিছু নেই। এ তো আল্লাহর বিধানের শাসন আবশ্যককারী সকল মূলনীতিগুলোকেই চুরমার করে দেওয়ার ঘোষণা।

অথচ এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান বহির্ভূত যেকোন শাসনব্যবস্থা শরীয়তে নিষিদ্ধ। কিন্তু এটা তো তার প্রকাশ্য বিরোধিতা, যা কোন আলেম তো নয়ই, কোন সাধারণ জ্ঞানী লোকও কখনো বলেনি।

দ্বিতীয় জবাব: নাজ্জাশী সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মারা গেছেন। আর সূরা মায়িদায়ই শাসন ও দ্বীন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি তা অবতীর্ণ হওয়ার দু'বছরের কিছু আগে তিনি মারা গেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ: 'আল-ইসাবা'য় বলেন: ইমাম তাবারী ও একদল আলেম বলেন: *তিনি নবম হিজরীর রজব মাসে মারা গেছেন। আর আরেক দল বলেছেন: তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মারা গেছেন। (ফাতহুল বারী: ১/২০৬)*

সুতরাং স্পষ্ট হয় যে, তার মৃত্যু এর পূর্বেই হয়েছিল। আর আমরা জানি, নামায ফরজ হয়েছে মিরাজের ঘটনায়। যখন এখনো দ্বীন পরিপূর্ণ হয়নি। তখন তারা মুসলিম ছিলেন; অথচ নামায পড়তেন না।

অতএব শরীয়ত আপনার উপর সেটাই আবশ্যক করে, যেটা আপনার নিকট এসেছে, যা অতি স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়। এরপর যখন নামায ফরজ করে দেওয়া হল, তখন এটা পরিত্যাগ করা হয়ে গেল ইসলাম ভঙ্গের কারণ।

এমনিভাবে শাসনের ব্যাপারটিও। সুবহানাল্লাহ! প্রবৃত্তি পূজারীদেরকে প্রবৃত্তি কোন দিকে নিয়ে গেছে!

তৃতীয় জবাব: ঐ সকল লোকের নিকট এটা কিভাবে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হল যে, নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণের পরও খৃষ্টীয় ধর্মমত দ্বারা শাসন করেছেন? তারা যদি বলে: এটাই মূল অবস্থা। আমরা বলবো: বরং মূল অবস্থা তো হল, "ইসলাম পূর্বেও সব কিছুকে মিটিয়ে দেয়"।

তাই তার প্রতি উত্তম ধারণা হল: ইসলামের যা কিছু তার নিকট পৌঁছেছে, তিনি তার দ্বারাই শাসন করেছেন।

চতুর্থ জবাব: এ কথার অনিবার্য ফল দাড়ায় যে, যদি কোন শাসক স্বীয় প্রবৃত্তি কারণে, বা রাজ্যের ব্যাপারে আশঙ্কা হেতু জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমন আইন রচনা করে, যাতে সে সকল হালালকে হারাম করে এবং সকল হারামকে হালাল করে, তাহলে তার জানাযা নামায পড়া যাবে এবং রাসূল সা: যেমন নাজ্জাশীকে 'নেককার লোক' বলেছেন, তাকেও সেরূপ বলা যাবে।

পঞ্চম জবাব: আয়াতটি নাযিল হয়েছে রাসূল সা: কে একথা জানানোর জন্য যে, তিনি যখন আহলে কিতাবদের মাঝে ফায়সালা করেন, তখন যেন আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দ্বারাই শাসন করেন। তখন সংকটপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ}.

এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত হলাম। অন্যথায় এই খড়কুটোর জবাব দেওয়া একেবারে সহজ। এটা ভ্রুক্ষেপেরও যোগ্য নয়।

সালাফগণ এটাকে কোন প্রশ্ন হিসাবেই বিবেচনা করেননি। এটা হল পরবর্তীদের সৃষ্ট। বেঁচে থাকলে সামনে আরোও ঘৃণ্য আরও গুরুতর এবং আরও বেশি পরিমাণে এধরণের প্রশ্ন দেখতে পাবেন।

মোটকথা: কিতাব-সুন্নাহ থেকে আহরিত মূলনীতি স্থির হওয়ার পরও অনেকে ইবনে আব্বাস রা: এর উদ্ধৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অনেকে এর কারণে পরস্পর বিরোধী কথা বলেছেন।

শুধু তাই নয়; একদল মুরজিয়া এ কথাও বলেছে যে, শরীয়ত পরিবর্তনকারী, যতক্ষণ সেটাকে হালাল মনে না করবে, ততক্ষণ পর্যন্তা তাকে কিছুতেই কাফের আখ্যায়িত করা যাবে না। আল্লাহই আশ্রয়।

আমাদের যা করণীয়, তা হল, কিতাব-সুন্নাহর দিকে ফিরা এবং সালাফদের সকল উদ্ধৃতিরসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা, তার থেকেই মূলতত্ত্ব বের করো।

অন্ধ অনুসরণ ও প্রবৃত্তি বশত: ইবনে আব্বাস রা: এর মুনকার বর্ণনাটিকে আকড়ে ধরা আর তার থেকে বর্ণিত বাকী সকল বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলোকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

সারকথা:

যে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা শাসন করল, সে কুফরীতে লিপ্ত হল। তখন তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

তথা তাকফীরের সকল শর্তগুলো পূরণ করা হবে এবং সকল বাঁধাগুলো নিশ্চিতভাবে দূর করা হবে; সন্দেহপূর্ণভাবে নয়। এভাবে যদি সে তাওবা করে তাহলে আলহামদু লিল্লাহ।

আর যদি প্রমাণ ও দলিল পেশ করা সত্ত্বেও তাতে অটল থাকে ও অহংকার করে তাহলে তার উপর আল্লাহ প্রদত্ত কুফরের হুকুম কার্যকর করা হবে।

একমাত্র আল্লাহই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী।